হেলথ প্রোগ্রাম ২
এইডস্ এবং বাংলাদেশ ৫
পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষ ৪

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩ মাঘ ১৪০৪

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানসমূহ

মোঃ হুমায়ূন কবির

স্বাস্থ্য শিক্ষা

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রথম ধাপ হলো স্বাস্থ্য শিক্ষা। স্বাস্থ্য শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতি যা জনগণের জ্ঞান, মনোভাব বা আচার-আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে সুষ্ঠু অনুশীলনের জন্য প্রভাবিত করে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ। সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে এবং পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে, এমনকি পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখার ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন করার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সত্যিই কঠিন কাজ। এর একমাত্র কারণ আমাদের জনসাধারণের বিরাট অংশ নিরক্ষর। এই নিরক্ষর জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সফলতা। এ-কাজটি করা যদিও কষ্টসাধ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও

মাঠ-পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা

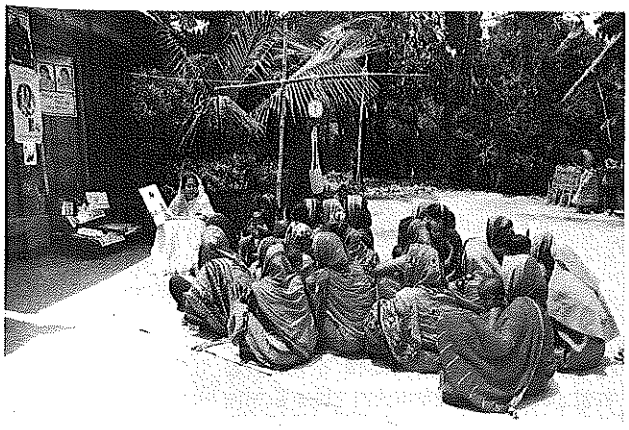

কর্মচারীদের প্রচেষ্টার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে।

ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ১৯৯৩-১৯৯৪-এর তথ্য অনুযায়ী ৮৯% স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করে; ৬% ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রী সমর্থন করে; ৩% ক্ষেত্রে শুধু স্বামী সমর্থন করে; এবং ২% ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করে না। একই সূত্রমতে ১৯৮৩ সালে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞান ছিলো ৩৩% দম্পতির; ১৯৯৩-৯৪ সালে এ-সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো ৬৩% দম্পতির; ১৯৮৩ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতো ১৯% দম্পতি; ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে ব্যবহার করতো ৪৫% দম্পতি।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে যে-চিত্র ফুটে ওঠে, নিচের ছকে-দেখানো শিশুমৃত্যুর হার দিয়ে তা অনুধাবন করা যায়:

বয়স-ভিত্তিক শ্রেণী	১৯৭৯-৮৩	১৯৮৪-৮৮	১৯৮৯-৯৩
১ বৎসরের কম-বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	১১৭ জন	১১২ জন	৮৭ জন
১-৪ বৎসর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৭২ জন	৫৯ জন	৫০ জন
৫ বৎসরের কম-বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	১৮০ জন	১৬৪ জন	১৩৩ জন

এসব তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মনোভাব, জ্ঞান ও অনুশীলনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে রয়েছে তাদের সচেতনতা। এই সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাই হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল বিষয়।

শিশুমৃত্যুর হার কমানোর পিছনে টিকাদান কর্মসূচি; বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক যেসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা উন্নত দেশের তুলনায় সন্তোষজনক নয়, কিন্তু এ-দেশে অশিক্ষিতের হার এত বেশি যে, সে-তুলনায় অগ্রগতি মোটামুটি ভালো। এই অবস্থার আরো উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা দরকার।

খাদ্য ও পুষ্টি

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি। মানুষের জন্য আমৃত্যু খাদ্য ও পুষ্টি একান্ত অপরিহার্য। শারীরিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে খাদ্য ও পুষ্টি বয়সের আনুপাতিক হারে প্রয়োজন। খাদ্য ও পুষ্টির

(৩-এর পাতায় দেখুন)

স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম

খালেদ শামসুল ইসলাম*
মহসীন আহমেদ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের শিশু ও কিশোর (বিবিএস, ১৯৯৬)। এদের বয়স ৬ থেকে ১৫ বছর। নিচের ছকে এদের বয়স-ভিত্তিক শতকরা হার দেখানো হলো:

চিত্র: বাংলাদেশের শিশু-কিশোর জনসংখ্যার বয়স-ভিত্তিক শ্রেণী-বিন্যাস

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ-বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, একটি দেশের শিশু-কিশোরদের অবশ্যই স্বাস্থ্যবান হতে হবে। শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে যে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন তা প্রদান করার ক্ষেত্রে পরিবারের পরেই বিদ্যালয়ের স্থান। বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব।

এ-বয়সের শিশুদের নানা ধরনের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাড়ির মত নিরাপদ স্থান থেকে বেরিয়ে অন্য পরিবেশে আসার কারণে এদের দৈহিক ও মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ঝুঁকিও থাকে। তাছাড়া, উন্নয়নশীল দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কিশোর অপুষ্টিতে ভুগছে। তাই স্কুলগামী শিশু-কিশোরদের দৈহিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

স্কুল হেলথ্ ধারণাটি নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে ১৯৫১ সনে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পৌরসভায় মোট ৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। পর্যায়ক্রমে ১৯৭৩ সন নাগাদ দেশের বিভিন্ন জেলায় এধরনের আরো ২০টি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্লিনিকের মূল কর্মকান্ড ছিলো নিরাময়ক ব্যবস্থা। পরবর্তী কালে একটি জরিপে দেখা যায়, এসব ক্লিনিকে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২% এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬% শিশু-কিশোর সেবা পেয়েছে–যা ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম।

বিভিন্ন নিরীক্ষায় দেখা যায়, আমাদের দেশের স্কুলগামী শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি নিম্নরূপ:

- অপুষ্টি
- নাক, কান ও গলার সংক্রমণ
- কৃমি সংক্রমণ
- চর্মরোগ
- দাঁতের ক্ষয়রোগ
- সংক্রামক ব্যাধি: হুপিং কাশি, হাম, ইত্যাদি
- দৃষ্টিস্বল্পতা
- জলবসন্ত
- দুর্ঘটনা: সড়ক, পানিতে ডুবে-যাওয়া, মারপিটজনিত আঘাত

এসব সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণ অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। এ-দু'টি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমন্বিত প্রচেষ্টায় উল্লেখিত স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাসহ শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইড্স্ বিষয়ক জ্ঞানদান অন্তর্ভূক্তির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের অবশ্যই নিজের দেহ সম্পর্কে জানার প্রয়োজন আছে। একজন কিশোর বা কিশোরীর দেহের নানা পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের সচেতনতা গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই সচেতনতা তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সহায়ক হবে। একজন কিশোরীর জানা প্রয়োজন তার মাসিক সম্পর্কে। কেন মাসিক হয় এবং কী করে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ-তথ্যটুকু তার একান্ত প্রয়োজন। তেমনিভাবে একজন কিশোরের জানা প্রয়োজন কেন স্বপ্নদোষ বা নৈশস্খলন হয়। এ-বয়সের কিশোরীদের স্তনের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে এবং কিশোরদের মধ্যে হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা সাংঘাতিক রকম মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। তাদেরকে এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে বর্তমানে নেই। সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সব সময় সঠিক না-ও হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাংলাদেশে আশংকাজনক হারে এইচআইভি-পজিটিভ রোগী আছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করা যায়, কোনো দেশে এইচআইভি দেখা দিলে তা অতি দ্রুত জনগোষ্ঠির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও প্রধানত যৌনসংসর্গের মাধ্যমেই এই ভাইরাস ছড়ায়, তথাপি সূঁচ, ব্লেড, ক্ষুরের মাধ্যমেও তা ছড়িয়ে পড়ে। এসব তথ্য আমাদের শিশু-কিশোরদের জানা প্রয়োজন।

স্কুলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে শিশু-কিশোরদের সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য গড়ে তোলা এবং এইড্স্ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ সরকার স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ-কর্মসূচির শুরুতে ১৯৯৩ সনে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি জরিপ সম্পন্ন করার পর মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৬ সনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'স্কুল হেলথ পাইলট প্রজেক্ট' নামের একটি কার্যক্রম শুরু করে। এ-প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ন্যাশনাল কারিকুলাম এণ্ড টেক্সট বুক বোর্ডের সহায়তায় পাঠ্য বইসমূহে স্বাস্থ্য-বিষয়ক অধ্যায়ের পুনর্বিন্যাস এবং নব-সংযোজন। এছাড়া, প্রতিটি স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং অসুস্থ শিশু-কিশোরদের স্থানীয় সরকারি চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও এ-কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক।

স্কুল হেলথ পাইলট প্রজেক্ট ইতোমধ্যেই দেশের প্রতিটি স্কুল থেকে পর্যায়ক্রমে একজন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তাঁর স্কুলে অন্যান্য শিক্ষকদের সহায়তায় কারিকুলাম অনুসরণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করবেন। তাছাড়া, এ-প্রজেক্টে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি স্কুলের জন্য একটি "ফার্স্ট এইড" বক্স সরবরাহ করছে। এতে করে, প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং গুরুতর অসুস্থতায় চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ-প্রজেক্ট স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদ্যালয়ের মত সুন্দর প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের শিশু-কিশোরগণ তাদের সার্বিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য নিয়ে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করবে—এই আমাদের প্রত্যাশা। ◆

*ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য হেলথ পাইলট প্রজেক্ট

(১ম পাতার পর)

মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টকর। খাদ্য বলতে আমরা বুঝি: যা আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি। পুষ্টির উৎস হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্য মায়ের দুধের মধ্যেও যা নিহিত রয়েছে।

খাদ্যকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ এবং পানি। মানুষের শরীরও এই ছয়টি উপাদানে গঠিত। মানুষের শরীরে এই ছয়টি উপাদানের শতকরা হার নিম্নরূপ:

উপাদান	শতকরা হার
পানি	৬৩
আমিষ	১৭
চর্বি	১২
ভিটামিন ও খনিজ	৭
শর্করা	১

আমাদের শরীর কেবল জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলেই রোগের সৃষ্টি হয় না। যদি উল্লেখিত খাদ্যের উপাদান শরীরে ঠিকমত না থাকে, সেক্ষেত্রেও

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে যেসব মায়েরা আইসিডিডিআর,বি-তে আসেন, পুষ্টি বিষয়েও তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়

শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে, কারণ শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়; আমিষজাতীয় খাদ্য শরীর গঠনে সহায়তা করে এবং ভিটামিন ও খনিজজাতীয় খাদ্য রোগ-প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। পানির অপর নাম জীবন। কাজেই শরীরে পানির স্বল্পতা দেখা দিলে জীবনের অবস্থা যে কী হবে তা সহজেই বোধগম্য।

শরীরকে সুস্থ রাখতে, শরীরের শক্তি অর্জনের জন্য, শরীর গঠনে এবং রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, সুষম খাদ্য কী? সুষম খাদ্য হলো সেই খাদ্য যাতে ছয়টি উপাদান নিহিত আছে। অনেকে প্রশ্ন করেন: মাছ, মাংস, দুধ, ডিম নিম্ন-আয়ের লোকদের পক্ষে যোগার করা সম্ভব নয়। এ-প্রশ্নের উত্তর হলো: এসবের বিকল্প খাবার কী তা জানতে হবে এবং তা খেতে হবে, কারণ বিকল্প খাবার তুলনামূলকভাবে সস্তা। কাজেই কোন খাদ্যের কী পরিমাণ পুষ্টিমান রয়েছে তা জানতে হবে। এ-ব্যাপারে একজন চিকিৎসকের চেয়ে স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা অধিক। জনগোষ্ঠিকে এ-ব্যাপারে তাঁরা সচেতন করে তুলবেন– ফলে অপুষ্টিজনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

আমাদের দেশে অপুষ্টিজনিত সমস্যা গুরুতর। শতকরা ৫০ জন নবজাতকের জন্ম-ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, ভিটামিন-এ'র অভাবে রাতকানা, লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতা এ-দেশের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলোর অন্যতম।

মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার বলতে আমরা বুঝি স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান বা অন্য কোনো আত্মীয়কে নিয়ে এক বাড়িতে বসবাস-করা কয়েকজন মানুষ। পরিকল্পনা বলতে বুঝি: জীবনধারণের জন্য একটি নীল-নকসা তৈরি করা যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা যায়। কাজেই পরিবার পরিকল্পনা বলতে বুঝি: পরিবারের সদস্যদের সুখ-শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি নীল-নকসা তৈরি করা। এই নীল-নকসার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে স্বামী ও স্ত্রী তাদের সন্তানসংখ্যা কতজনের মধ্যে সীমিত রাখবেন; পরিবারের স্বাস্থ্য উন্নত রাখতে কী কী করতে হবে; নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কী করতে হবে; পরিবারের সদস্যসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য কী করতে হবে—অর্থাৎ পরিবারের সুখের জন্য পরিকল্পনা করাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা হয় কিংবা অন্য কথায়: আর্থিক সংগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পরিবার গঠনের পরিকল্পনাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পরিবার পরিকল্পনা হলো এমন একটি চিন্তা বা আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা যাতে ব্যক্তি বা দম্পতি তাদের জ্ঞান, মনোভাব ও দায়িত্বের মাধ্যমে পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কল্যাণ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রসার ঘটাবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিবার পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত। জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে: অনাকাঙ্ক্ষিত জন্মকে রোধ করা এবং কাঙ্ক্ষিত জন্মকে নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: খাবার বড়ি, কনডম, কপার-টি, ইনজেকশন, নরপ্ল্যান্ট, মহিলা বন্ধ্যাকরণ ও পুরুষ বন্ধ্যাকরণ। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে জন্মের হার ছিলো ৬.৩ এবং বর্তমানে ৩.৩। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর শতকরা হার ১৯৭৫ সনে ছিল ৮ এবং বর্তমানে ৪৯। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দের পরিশ্রম এবং পাশাপাশি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা। সবার সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এই অগ্রগতিকে ধরে রাখা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা আজ আমাদের লক্ষ্য।

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

পানির অপর নাম জীবন। আমাদের শরীরে ৬৩ ভাগ পানি রয়েছে। কাজেই পানির অভাবে জীবনের পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। প্রতিটি মানুষের দৈনিক খাবার, গোসল ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য প্রয়োজন ১৫০ থেকে ২০০ লিটার পানি। এই পানি হওয়া চাই নিরাপদ। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে রোগের বিস্তার ঘটে। আমাদের দেশে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পানিবাহিত রোগের মধ্যে রয়েছে কলেরা, ডায়রিয়া, জন্ডিস, ইত্যাদি। আমাদের দেশে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দূষিত পানি পান করা ও আনুষঙ্গিক কাজে এর ব্যবহার। এসব পানিবাহিত রোগ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো সবক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা। বিশুদ্ধপানির উৎস হচ্ছে টিউবওয়েল বা সরবরাহকৃত পরিশোধিত পানি। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন: খাবার পানি ও খাবার সময় থালা-বাসন ধোয়ার জন্য অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে টিউবওয়েলের বা সরবরাহকৃত পানি না পাওয়া গেলে পুকরের পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন মলত্যাগের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে না (বিবিএস, ১৯৯৬)। নিরাপদ পায়খানা বলতে বুঝায়: মলত্যাগের জন্য এমন ব্যবস্থা বা স্থান যেখান থেকে পরিবেশ, বিশেষ করে পানির উৎসে রোগ ছড়াতে না পারে-- ফলে মলের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব না ঘটে। খোলা জায়গায় মলত্যাগ করার কারণে পানি দূষিত হয়। ফলে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাছাড়া, কৃমি এবং পলিও রোগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। এসব রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা

অপরিহার্য। প্রতিটি থানায় স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডে যাঁরা জড়িত তাঁরা জনগণকে এ-ব্যাপারে সচেতন করে তুলবেন এবং ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন। তাছাড়া, প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রতিটি পেশার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ-ব্যাপারে ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রসারিত টিকাদান

আমাদের দেশে ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হাজারে ১৩৩ জন (বিডিএস, ১৯৯৩-৯৪)। ১ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হাজারে ৮৭ জন। শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হচ্ছে কয়েকটি রোগ, যেমন: ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, পলিও মাইলাইটিস এবং যক্ষা। তাছাড়া, ভিটামিন-এ'র অভাবে অনেক শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। এসব রোগের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় টিকাদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। টিকাদান কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পর শিশুমৃত্যুর হার ১৯৭৫ সালের ১১২ জন থেকে বর্তমানে ৮৭ জনে নেমেছে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। আমাদের দেশে সকল টিকা নিয়েছে এমন শিশুর শতকরা হার ৬০ ভাগ। এখনও ৪০ ভাগ শিশুকে সকল টিকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে টিকাদান কর্মসূচিতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মী ও কর্মচারীদের কর্মকান্ডের পাশাপাশি সকল সচেতন নাগিরককে সম্পৃক্ত করে উদ্বুদ্ধকরণের কাজকে আরও জোরদার করতে হবে। জাতীয় টিকাদান দিবস (NID) কর্মসূচিতে এ-কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে NID কর্মসূচির অর্জিত হার খুবই সন্তোষজনক। টিকাদান কর্মসূচির সন্তোষজনক ফল পেতে হলে NID-এর সাফল্যের কারণসমূহ অনুসন্ধান ও অনুসরণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবী জুড়ে পলিও রোগ নির্মূল করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ-কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে জাতীয় টিকাদান দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠি এ-কর্মসূচিতে সাড়া দিয়েছেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলে দেশ জুড়ে একই দিনে অনুর্দ্ধ ৫ বছরের শিশুদের পলিও টিকা খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে।

সাধারণ অসুখসমূহ ও জখমের চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ

আমাদের দেশে সাধারণ অসুখের হারও কম নয়, কিন্তু এসব অসুখের চিকিৎসা একজন স্বাস্থ্যকর্মী সহজেই প্রদান করতে পারেন যদি এ-ব্যাপারে তাঁর প্রশিক্ষণ থাকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় এ-বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মকান্ডে স্বাস্থ্যকর্মীগণ জড়িত। কাজেই এ-ব্যাপারে তাঁদের সম্যক জ্ঞান রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী সাধারণ অসুখ ও জখমের প্রাথমিক চিকিৎসা সহজেই প্রদান করতে পারেন।

সাধারণ রোগ ও বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ অপরিহার্য। সেজন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমাদের দেশে কৃমি, এ.আর.আই, ডায়রিয়া, সর্দি, কাশি, জ্বর, চর্মরোগ, রক্তস্বল্পতা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য দরকার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহ নিয়মিত সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ অসুখ ও জখমের চিকিৎসা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

আঞ্চলিক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ

সংক্রামক রোগ বলতে আমরা বুঝি: যা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে বা অন্যভাবে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়। ডায়রিয়া, এ.আর.আই, চর্মরোগ, জলবসন্ত, যৌনব্যাধি, ইত্যাদি সংক্রামক রোগ। এইড্‌স্ রোগও সংক্রামক। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে কিছু কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা বা রোগ আছে যা ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া তেমনি একটি সংক্রামক ব্যাধি। আবার, সাম্প্রতিক কালে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। শরীরে আয়োডিন ঘাটতির ফলে গলগন্ডও একটি আঞ্চলিক পুষ্টি সমস্যা। এসব রোগের হাত থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া। আমরা জানি Prevention is better than cure-এই সত্যটি সামনে রেখে আমাদের দেশে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সকল পেশার সরকারি ও বেসরকারি কর্মকতা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দের। সেইসাথে সচেতন নাগরিকদেরকেও এ-কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এ-ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

মানসিক সুস্থতার জন্য ব্যবস্থা

মানসিক অশান্তি বিরাজ করলে মানুষের শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়— যা পরিবারকে অশান্তিতে নিমজ্জিত করে। মানসিক সুস্থতার জন্য পরিবার, অফিস-আদালত, সমাজ এবং রাষ্ট্রে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। সুন্দর পরিবেশ মানসিক অবস্থাকে সুস্থ রাখতে অনেকাংশে সহায়তা করতে পারে। আবার, আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপরও মানসিক সুস্থতা অনেকটা নির্ভর করে। মানসিক সুস্থতার জন্য বিনোদনমূলক কিছু ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়। মানসিক সুস্থতা শুধুমাত্র একটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই মানসিক সুস্থতার জন্য প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকতে হবে সহমর্মিতাবোধ। পরিবার, সমাজ, অফিস-আদালত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি মেনে চলার এবং সেবামূলক মানসিকতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উল্লেখিত বিষয়সমূহ যদি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তাহলে দেশের অধিকাংশ জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। ◆

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষ

(৮-এর পাতার পর)

আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন সহযোগিতা করতে পারছেন না।

৪. কোনো বিশেষ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অধিকাংশ দম্পতির সহজলভ্য সকল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকে না। সকল পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যাদির অভাব অনেক ক্ষেত্রেই দম্পতিদের মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে।

উপসংহার

উল্লেখিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য দু'টি প্রধান দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো: আধুনিক পুরুষ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ্যে ধারণা প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে: পুরুষ-পদ্ধতি গ্রহণের হার পুরুষদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সরঞ্জাম সরবরাহের সাথে সংযুক্ত। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কিভাবে পুরুষদের কাছে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা যায় এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার। অতীতে যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে এই গবেষণাকর্মের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন কৌশলের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন করে একটি সঠিক ও কার্যকর কৌশল বের করতে হবে। ◆

এইড্‌স্ এবং বাংলাদেশ

মহসীন আহমেদ
শাকিল মাহমুদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে এইড্‌স্ রোগের ভাইরাস এইচআইভি-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আগামী ২০০০ সাল নাগাদ এ-সংখ্যা ৭ লাখে পৌছবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে থাইল্যান্ড, ভারত, মায়ানমার এবং কম্বোডিয়াকে এশিয়ার, এইচআইভি এবং এইড্‌স্-এর 'ভূকম্পন কেন্দ্র' বা এপিসেন্টার বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছে।

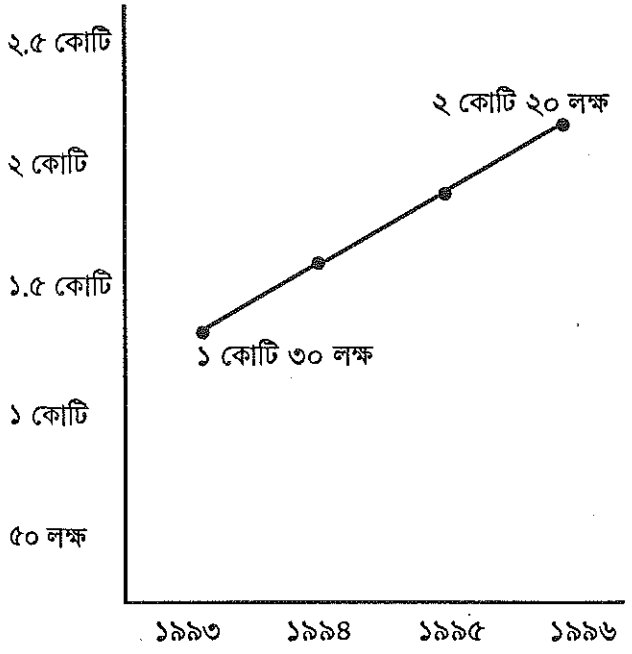

১৯৮১ সনে যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ সমকামীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এইড্‌স্ রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিলো। পরবর্তী কালে মহিলা এবং শিশুদের মধ্যেও এইড্‌স্ রোগ ধরা পড়ে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এইড্‌স্ রোগ বিস্তার লাভ করেছে। এই বিস্তারের গতি অতি দ্রুত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এইচআইভি-তে আক্রান্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন উন্নয়নশীল দেশের। UNAIDS-এর মতে বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন প্রায় ৮,৫০০ জন এইচআইভি-তে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে এক হাজার শিশু। আক্রান্ত পুরুষ ও নারীদের হার প্রায় সমান।

চিত্র: বিশ্বব্যাপী এইচআইভি-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা (সূত্র: UNAIDS)

এইড্‌স্ বিস্তারে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইড্‌স্ রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র ভারতেই ত্রিশ লক্ষ লোক এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়েছেন (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৯৭)। বাংলাদেশে এইড্‌স্ রোগের প্রবেশ এবং বিস্তারের মাধ্যমগুলি কী হতে পারে? এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ যে মত পোষণ করেন তা এ-নিবন্ধের বাকি অংশে উল্লেখ করা হলো:

অপরিচিত যৌনসঙ্গী এড়িয়ে চলুন কিংবা কনডম ব্যবহার করুন

ভ্রমণ এবং যৌন-আচরণ

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭৪ হাজার লোক বিদেশে গমন করেন। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে আমাদের দেশের লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যেক বছর দেশে ফিরে আসে। এছাড়া, বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ বিদেশী পর্যটক বেড়াতে আসেন। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট সাড়ে তিন লক্ষ লোকের রক্ত পরীক্ষায় ৭৬ জনের মধ্যে এইচআইভি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের পেশা জানা যায়নি। যাদের পেশা জানা গিয়েছে তাদের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আগত বাংলাদেশী। অঞ্চল-ভিত্তিক বিশ্লেষণেও লক্ষ করা যায়, যেসব এলাকায় লোকজন বিদেশে যাতায়াত করে বেশি সেখানে এইচআইভি-আক্রান্ত লোকের সংখ্যাও বেশি।

দেশের অভ্যন্তরেও মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবিকার অন্বেষণে, নদীর ভাঙ্গনে এবং আরো নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে কী পুরুষ কী নারী গ্রাম ছেড়ে হচ্ছে শহরমুখী।

বাংলাদেশের মানুষের যৌন-আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা এখনও আমাদের নেই। সাম্প্রতিক কিছু জরিপের ফলাফল থেকে বিষয়টি ক্রমশ স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে। জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৫০ জন বাংলাদেশী পুরুষ বিয়ের পূর্বে যৌনসম্পর্ক গড়ে থাকেন। বিয়ের পরও বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যৌনসম্পর্কের তথ্য জানা গেছে। এসব জরিপ থেকে আরো প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে সমকাম এবং অন্যান্য যৌন-আচরণও বিদ্যমান। বাংলাদেশে রয়েছে ১ লক্ষ নারী পতিতা। এদের কেউ কেউ পতিতালয়ে, আবার কেউ ভাসমান জীবনে যৌন-ব্যবসা করে থাকে। আমাদের সমাজের নানান স্তরের এবং পেশার লোকেরা এদের সাথে যৌনসম্পর্ক গড়ে থাকেন। ব্যবসায়ী, ছাত্র, রিক্সা-চালক, গাড়ি-চালক, বিদেশ-ফেরতরাই এসব যৌন-কর্মীদের প্রধান গ্রাহক। জরিপের ফলাফলে আরো দেখা যায়, আমাদের দেশের এই পতিতাদের অর্ধেকেরও বেশি কোনো-না-কোনো যৌনরোগে ভুগছে এবং যারা এদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলছে তাদের অতি নগণ্যসংখ্যক কনডম ব্যবহার করে থাকে। এক কথায় বলা যায়: এসব যৌনসম্পর্ক হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ। যারা পতিতাদের সঙ্গে

ঝুঁকিপূর্ণ যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলছে তারা নিজেরা যেমন এইচআইভি-তে আক্রান্ত হতে পারে তেমনি পতিতাদেরও আক্রান্ত করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করে থাকেন যে,

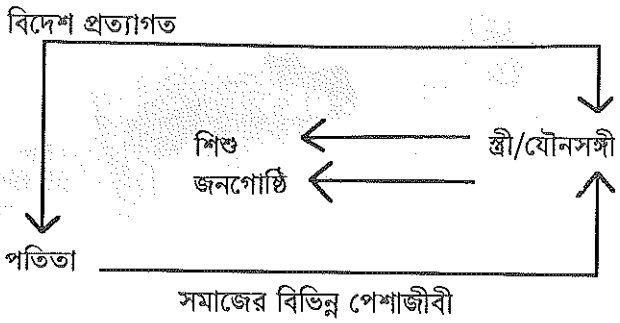

চিত্র: বাংলাদেশের জনগোষ্ঠিতে এইড্‌স্ রোগ বিস্তারের ধারণা-চিত্র

পতিতালয়ে গমনকারী পুরুষরা নিজ সমাজে ফিরে এসে স্ত্রী বা অন্য যৌনসঙ্গীকে আক্রান্ত করতে পারেন। একবার স্ত্রী বা যৌনসঙ্গী আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুর দেহেও এইচআইভি ছড়াতে পারে। বাংলাদেশে মানুষের চলাচল বৃদ্ধি এবং সেই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণ এইড্‌স্ রোগ বিস্তারে সহায়ক।

রক্ত পরিসঞ্চালন

বাংলাদেশে চিকিৎসা-সেবার প্রয়োজনে বছরে প্রায় দুই লক্ষ ইউনিট রক্ত পরিসঞ্চালিত হয়ে থাকে। এই চাহিদার ৭০ ভাগ মেটায় পেশাদার রক্তদাতাগণ এবং ৩০ ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাগণ। যেসব রোগ রক্ত-পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে তাদের মধ্যে এইড্‌স্ গুরুত্বপূর্ণ। হেপাটাইটিস-বি, সিফিলিস, ইত্যাদি রোগও রক্ত-পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়ায়। সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে: পেশাদার রক্তদাতাদের ২১ শতাংশ হেপাটাইটিস-বি এবং ১৬ শতাংশ সিফিলিস রোগে ভুগছে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত-- কিছু ব্যতিক্রম বাদে--রক্ত পরিসঞ্চালনের কাজটি সম্পন্ন হয় উল্লেখিত রোগ-নিরূপণ পরীক্ষা ছাড়াই। এটা আমাদের জন্য আশংকাজনক।

অন্যান্য

অস্ত্রোপচারে ব্যবহার্য অপরিচ্ছন্ন ও অপরিশোধিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও এইচআইভি বিস্তার লাভ করতে পারে। আমাদের দেশে যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে এদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, কিন্তু এরা সচরাচর একই সিরিঞ্জ অনেকে ব্যবহার করে। এতে করে, দলের কারো এইচআইভি থাকলে তা সূঁচের মাধ্যমে অন্যজনের দেহে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। তেমনিভাবে নাপিতের ক্ষুর ও কেঁচির মাধ্যমেও এইচআইভি ছড়াতে পারে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছে অনেক সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিশোধনের সঠিক তথ্য জানা নেই। যথাযথভাবে পরিশোধন না করা হলে এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে, এমনকি সেবাদানকারী নিজেও আক্রান্ত হতে পারেন।

এইড্‌স্ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে জাতীয় এইড্‌স্ কমিটি (NAC) গঠিত হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ-কমিটির সভাপতি। এ-কমিটির তত্ত্বাবধানে এইড্‌স্ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে যেসব কাজকর্ম শুরু হয়েছে, তা হলো:

সার্ভিলেন্স: ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশে এইড্‌স্ রোগের ওপর জরিপ শুরু হয়েছে। জনগোষ্ঠির বিভিন্ন অংশের, অর্থাৎ বিদেশ-প্রত্যাগত, যৌনকর্মী, ছাত্র, যান-চালক, গার্মেন্টিস কর্মীদের জরিপ এখনও চলছে।

যৌনরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি বিশেষ প্রকল্প দেশের সর্বত্র যৌনরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ-প্রকল্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসা Syndromic Management বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় যৌনরোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।

রক্ত-পরিসঞ্চালন নীতিমালা: এইড্‌স্ ভাইরাসের পরীক্ষা ব্যতীত কোনো রক্ত পরিসঞ্চালন করা হবে না; পর্যায়ক্রমে এর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: সকল মাধ্যমকে ব্যবহারের দ্বারা জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা হচ্ছে।

কনডম ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ: কনডম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন যৌনরোগ এবং এইড্‌স্ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডমের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এইচআইভি নিরূপণ: দেশের সাতটি কেন্দ্রে এইচআইভি নিরূপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি হলো: জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, পিজি হাসপাতাল, আইইডিসিআর, আর্মি প্যাথলজী ঢাকা, এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও খুলনা মেডিক্যাল কলেজ।

বেসরকারি সংস্থার সমর্থন: বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা সক্রিয়ভাবে সরকারের সাথে এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছে।

** নিবন্ধটি রচনার জন্য মেঃ জেঃ এম.আর. চৌধুরী এবং সঙ্গীদের রচিত Meeting the Challenges of HIV/AIDS in Bangladesh, Dhaka-December 1996 প্রতিবেদনটির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে*

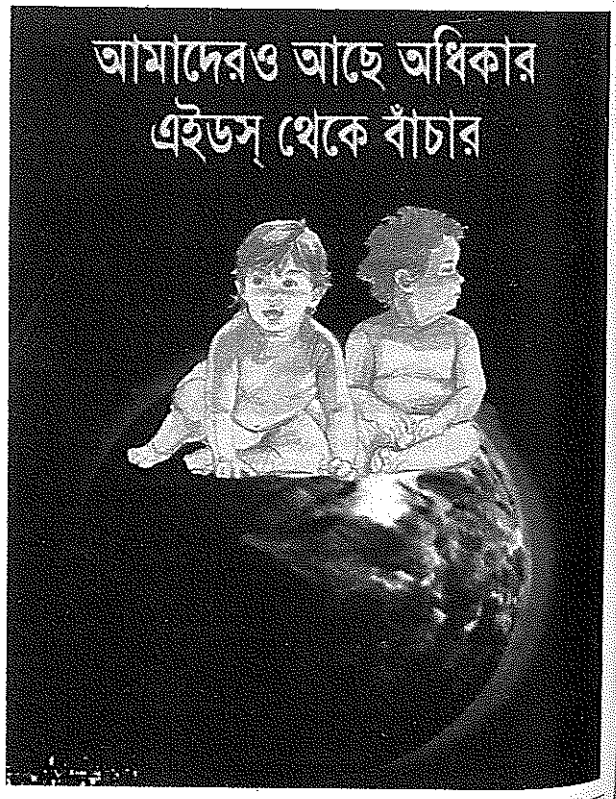

স্বাস্থ্য কুইজ-২১

১. মারাত্মক নিউমোনিয়ায় ০-২ মাস বয়সের শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে কত?
৪০/৫০/৬০ বা তারও বেশি?

২. হাড্ডিসার (ম্যারাসমাস) রোগ কাকে বলে। এ-রোগের ৫টি উপসর্গ ও লক্ষণ কী কী?

৩. যেসমস্ত সক্ষম দম্পতি বর্তমানে জন্মবিরতির ইচ্ছা পোষণ করছেন অথচ বর্তমানে কোনো সন্তান নেই তাঁদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন্ কোন্ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য?
- খাবার বড়ি
- ইনজেকশন
- কনডম
- আই.ইউ.ডি
- বন্ধ্যাকরণ

৪. শিশুর স্বাভাবিক জন্ম-ওজন কত কেজি? জন্ম-ওজন কত কেজি হলে তাকে কম-ওজনের (Low-birth-weight) শিশু বলা হয়?

৫. পাতলা পায়খানা বা কলেরা হলে কেন বমি হয়? বমি কিভাবে বন্ধ করা যায়? কী ধরনের ওষুধ দিতে হবে এবং কেন?

(প্রশ্নগুলোর উত্তর ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ-২০ এর উত্তর

১. যেসব মহিলা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁদের জন্য ইনজেকশন গ্রহণযোগ্য– খাবার বড়ি নয়।

২. কোনো ক্ষতস্থানে ড্রেসিং-এর ৪টি উদ্দেশ্যে:
- বাইরের জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ প্রতিরোধ করা
- রক্তপাত বন্ধ করা
- রক্ত, পুঁজ, ইত্যাদি শুঁষে নেওয়া
- ক্ষতকে নিরাপদ রেখে রোগীকে আরাম দেওয়া ও অতিসত্বর ঘা শুকানোর ব্যবস্থা করা

৩. যক্ষারোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ৩টি অত্যন্ত জরুরী বিষয় হলো:
- রোগী সনাক্ত করা (সন্দেহজনক অর্থাৎ ঘনঘন জ্বর, কাশি ও ধীরেধীরে ওজন কমে-যাওয়া রোগী খুঁজে সঠিক পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা)
- উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান, (বিশেষ করে কফে জীবাণু পাওয়া গেলে)
- শিশুকে জন্মের সাথেসাথে বি.সি.জি. টিকা দেওয়া

৪. দুই বছরের কম-বয়সী শিশুদের কৃমির ঔষধ সেবন একবারে নিষিদ্ধ

৫. মায়েদের মৃত্যুর ৪টি প্রধান কারণ:
- প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ
- সংক্রামক রোগ
- অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাত
- প্রসবের সময় জটিলতা

(স্বাস্থ্য কুইজ-২০ এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেননি)

জেনে রাখা ভালো

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন এইড্স্ থেকে বাঁচুন

এইড্স্ রোগের লক্ষণ

এইড্স্-এর ভাইরাস দেহে প্রবেশ ক'রে দেহের প্রতিরক্ষা কোষকে আক্রমণ করে। কয়েক সপ্তাহে তৈরি হয় এন্টিবডি। কিছুদিন ভাইরাস থেকে দেহকে রক্ষা করে। ভাইরাস দেহে পরিপূর্ণতা পেতে সময় লাগে ১০ থেকে ১৫ বছর। এইড্স্ রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ:

১. কারণ ছাড়াই শারীরিক দূর্বলতা
২. চিকিৎসার পরও সারছে না এমন অবিরাম জ্বর
৩. দ্রুত ওজন কমে-যাওয়া
৪. মুখ, জিহ্বা ও গলায় সাদা ঘা-হওয়া এবং তা সহজে না-সারা
৫. ঘনঘন ডায়রিয়া হওয়া
৬. খুশখুশে কাশিতে ভোগা
৭. শরীরের কোনো অংশ থেকে কারণ ছাড়াই রক্তক্ষরণ
৮. নিউমোনিয়া, যক্ষা, ফাংগাস সংক্রমণ ও চামড়ায় ক্যান্সার হওয়া

এইড্স্ ছড়ায় যেভাবে

কেউ এইড্স্-আক্রান্ত হলে তার থেকে রোগটি অন্যদের দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইড্স্ ছড়ানোর পন্থাগুলো নিম্নরূপ:

১. যৌনমিলনের মাধ্যমে (সমকাম/বিপরীত কাম)
২. সংক্রামিত ইনজেকশনের সুঁচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে
৩. সংক্রামিত রক্ত পরিসঞ্চালনের দ্বারা
৪. সংক্রামিত মায়ের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর মধ্যে
৫. সংক্রামিত টিস্যু
৬. গভীর চুম্বন

এইড্স্ যেভাবে ছড়ায় না

১. এইড্স্ রোগীর মলমূত্র, হাঁচি, কাশি, থুথু'র মাধ্যমে
২. ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্রের মাধ্যমে
৩. মশা-মাছি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের কামড়ের মাধ্যমে
৪. দৈনন্দিন সামাজিক মেলামেশা, করমর্দন, কোলাকুলি, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একসঙ্গে বাস, খেলাধুলা, ইত্যাদি করলে
৫. পানি, তৈজসপত্র ও বাতাসের মাধ্যমে

এইড্স্ বিস্তার প্রতিরোধ করার উপায়

এইড্স্ রোগের বর্তমানে কোনো চিকিৎসা নেই, কোনো টিকা নেই। স্বাস্থ্য শিক্ষা একমাত্র উপায়। এইড্স্ বিস্তার প্রতিরোধের উপায় হলো:

১. অবৈধ যৌনসম্পর্ক থেকে বিরত থাকা
২. পরিচ্ছন্ন, নির্মল জীবনযাপন করা
৩. কেবলমাত্র একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখা
৪. সমকামিতাসহ সকল ধরনের বিকৃত যৌনাচার থেকে দূরে থাকা
৫. যৌনমিলনের শেষে মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করা
৬. কোনো স্বীকৃত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (যেখানে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ বা ডিসপোজেব্‌ল্ সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হয়) থেকে ইনজেকশন নেওয়া
৭. খৎনার যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত কি না তা নিশ্চিত করা
৮. নিজে রক্তদান করা। রক্তের প্রয়োজন হলে আত্মীয়-স্বজনের রক্ত গ্রহণ করা। পেশাদার রক্তদাতার রক্ত নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ
৯. রক্ত বা রক্তজাত ঔষুধ গ্রহণের পূর্বে তা এইড্স্মুক্ত কি না এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া
১০. রক্তনালীতে নেশাকারক ঔষধ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা
১১. পতিতালয়ে গমন থেকে বিরত থাকা

[সূত্র: বাংলাদেশ এইড্স্ প্রতিরোধ সংস্থা (বাও)

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

শামীম আরা জাহান

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ১৯৫৩ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ড সূচিত হয়। এই কর্মকান্ড বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। সময়ের সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সফলতার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শিক্ষামূলক এবং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহিলা মাঠকর্মীর দ্বারা মহিলা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ এবং অধিকাংশ ক্লিনিকে মহিলা সেবা প্রদানকারী দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক সেবা প্রদান এই সফলতার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সূচনালগ্ন থেকেই পুরুষদের পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিলো— অর্থাৎ মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই লক্ষ্য করে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিলো, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি গ্রহণে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রারম্ভে এরূপ ধারণা ছিলো যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বুঝানো এবং পদ্ধতি গ্রহণে সম্মত করানো অধিকতর সহজ হবে। এ-কারণেই অধিকাংশ কর্মকান্ড মহিলাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে এবং তুলনামূলকভাবে পুরুষদের ওপর এতটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

গত দুই দশকে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত জরিপে দেখা গেছে: পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার সাতগুণ বেড়ে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৩৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে (শতকরা ৩৬ ভাগ), তাদের মধ্যে মহিলা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর তুলনায় পুরুষ-পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। শতকরা ৩২ ভাগ দম্পতি ব্যবহার করছে মহিলা পদ্ধতি; অন্যদিকে মাত্র ৪ ভাগ দম্পতি ব্যবহার করছে পুরুষ-পদ্ধতি। এটা বস্তুতই মহিলা-ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের প্রভাব বলা যায়।

১৯৯৪ সালে মিশরের কায়রো শহরে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। এতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়: জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তার বাস্তবায়নে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সমান দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। আরও পরামর্শ দেওয়া হয় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানো উচিত এবং এর সাথে এই কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন।

বাংলাদেশে যাঁরা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাথে জড়িত, তাঁরাও তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করছেন যে, এই কর্মসূচির লক্ষ্যপূরণে পুরুষ নিজেরা যেমন তাঁদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন, তেমনি তাঁদের স্ত্রীদের পদ্ধতি গ্রহণে, তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে এবং একনাগাড়ে চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা প্রসারিত করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের নীতিমালায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পুরুষদের অংশগ্রহণকে অবিলম্বে একটি অগ্রাধিকারের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

গবেষণা

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পুরুষদের মনোভাব জানার জন্য বাংলাদেশে অল্প কিছু গবেষণা করা হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ পুরুষদেরই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। কেবল পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের মনোভাব জেনে পুরুষ-পদ্ধতি ব্যবহারে তাদের মনোভাব বোঝা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে: পুরুষরা জন্মনিয়ন্ত্রণের এবং পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে, কিন্তু বিশেষ করে পুরুষ-পদ্ধতি গ্রহণে তাদের মতামত জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আইসিডিডিআর,বি'র নগর-কেন্দ্রিক এমসিএইচ-এফপি এক্সটেনশন প্রজেক্ট ঢাকা শহর এলাকায় সাম্প্রতিক কালে একটি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে

১. আধুনিক পুরুষ-পদ্ধতি সম্পর্কে শহরের পুরুষদের মধ্যে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যদিও পুরুষরা তাদের পরিবার ছোট রাখতে এবং দুই সন্তানের মাঝে সময়ের ব্যবধান রাখতে চাইছে, তবুও পুরুষ-পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা আগ্রহী নয়। যারা অতীতে কনডম ব্যবহার করেছে, তাদের কনডম ব্যবহারের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা (যেমন কনডম ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ করা, যৌনসুখ পরিপূর্ণভাবে না-পাওয়া, কনডম ব্যবহারের সময় ফেটে-যাওয়া, কিংবা কনডমে ফুটো থাকার কারণে ভরসা না-পাওয়া) কনডম ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানসিক বাধার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, যারা কখনই কনডম ব্যবহার করেনি তারা কনডম ব্যবকারকারীদের অভিজ্ঞতা জেনে অথবা গুজব ও ভ্রান্ত ধারণার কারণে পুরুষ-পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহী নয়। ভ্যাসেকটমি সম্বন্ধেও নানা ধরনের গুজব এবং ভুল ধারণা (যেমন ভ্যাসেকটমি করলে যৌনক্ষমতা কমে যায়, কর্মক্ষমতা থাকে না) শহর এলাকায় বিদ্যমান–যা এই পদ্ধতি গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

২. শহরের মহিলারা পুরুষ-পদ্ধতি গ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে একমত পোষণ করছে। কারণস্বরূপ মহিলারা উল্লেখ করেছে যে, মহিলা-পদ্ধতির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে, অথচ পুরুষ-পদ্ধতির কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষদেরও পদ্ধতি গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে যেসব মহিলা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদ্ধতি নিতে পারছে না, সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীদের পুরুষ-পদ্ধতি গ্রহণে এগিয়ে আসা উচিত।

৩. মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি (যেমন ইনজেকশন, আই.ইউ.ডি, ইত্যাদি) সম্পর্কে শহরের পুরুষদের সঠিক ধারণা নেই। এসব পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও শহরের পুরুষদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তাঁরা মহিলা-পদ্ধতি সম্পর্কে খুবই কম জানেন। এই কারণে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের কোনো একটি

(৪-এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; সম্পাদক ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান
সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ মহসীন আহমেদ, ডাঃ খালেকুজ্জামান, ডাঃ রমেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম.এ.রহীম ও শামীম আরা জাহান; ডিজাইন ঃ আসেম আনসারী;
প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬
টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে.; ই-মেইল : misk@icddrb.org

মুদণে ঃ সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী রেলগেট, ঢাকা